ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 869-875
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.300

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ধর্মতত্ত্ব’ গ্রন্থটির আলোকে ধর্ম বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সুদীপ পাল, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, কুলটি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.03.2026; Accepted: 23.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

We generally know that the word '*Dharma*' is derived from the root '*Dhri*' and the suffix '*Mana*', which means to hold. Therefore, it can be said that what holds is *Dharma*. Bankim Chandra refers to the Religion of Humanity as Dharma. In his book '*Dharmattva*', he has recognized four faculties of man, namely: one, physical faculty, two, knowledge-seeking faculty, three, practical faculty, and four, mental-pleasing faculty. The practice, development, and fulfillment of these faculties is humanity. According to him, the proper practice and mutual harmony of all these faculties is true humanity and this is human religion. And the true human religion depends on this practice. He means humanity or human religion by '*Dharma*'. For him, '*Dharma*' does not mean any superstition, mythology, or blind faith, but for him, '*Dharma*' is the practice of a moral sense and a form of human welfare. The present article will mainly present a brief review of religion in the light of Bankim Chandra's book '*Dharmattava*'.

Keywords: Faculty, Practice, Inspiration, Fulfillment, and Harmony

বঙ্কিমচন্দ্রের *‘ধর্মতত্ত্ব’* গ্রন্থে আমরা এক গুরু-শিষ্য পরম্পরা দেখতে পাই, যেখানে গুরু প্রশ্ন করছেন শিষ্য তার উত্তর দিচ্ছেন, আবার কোথাও শিষ্য প্রশ্ন করছেন গুরু তার উত্তর দিচ্ছেন, এইভাবে একটা পরম্পরা আমরা লক্ষ্য করি। এই গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তিনি সকল মানব সমাজকে তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বর্তমান এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের *‘ধর্মতত্ত্ব’* গ্রন্থটির আলোকে ‘ধর্ম’ বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র *‘ধর্মতত্ত্ব’* গ্রন্থে বলেছেন অনুশীলনই ধর্ম।[১] অনুশীলন বলতে বোঝায় নিয়মিত চর্চা, অভ্যাস ও আত্মশিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সত্যবাদিতা একদিনে অর্জিত হয় না, দয়া ও ন্যায়বোধ হঠাৎ জন্মায় না এবং আত্মসংযম একবারের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ হয় না। এসব গুণ ধীরে ধীরে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা শুধু পূজা-পার্বণ করলেই ধর্ম হয় না আবার শুধু ধর্মগ্রন্থ পড়লেই ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। জীবনে সত্য, প্রেম, ন্যায় ও দয়া প্রভৃতির চর্চা করাই হল প্রকৃত ধর্ম। ধর্ম মানে জীবনের নৈতিক গুণাবলির বাস্তব প্রয়োগ। তাঁর মতে, ধর্ম কেবল বিশ্বাস, আচার বা তত্ত্ব নয় বরং ধারাবাহিক নৈতিক চর্চা। ধর্ম হল

১. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫২৯।

জীবনের প্রতিদিনের সৎ অনুশীলন। আর এই নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ তার পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে। তিনি মনে করেন, মানুষ মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করলেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে না। মানুষের মধ্যে পশুত্ব, স্বার্থপরতা প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি থাকে। কিন্তু যখন সে সত্যকে গ্রহণ করে, ন্যায় পালন করে, দয়া ও প্রেম চর্চা করে এবং আত্মসংযম অবলম্বন করে তখনই তার প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। আর এই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশই হল মানবতা।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন অনুশীলনের ফল সুখ। তাঁর মতে যদি অনুশীলন ধর্ম্ম হয় এবং অনুশীলনের ফল সুখ হয় তাহলে ধর্ম্মের ফলও সুখ। ধর্ম্মের ফল ইহকালে সুখ, আর যদি পরকালে থাকে তাহলে পরকালেও সুখ। ধর্ম্ম সুখের একমাত্র উপায়।[২]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের ক্রোড়পত্র 'ক'-এ ধর্মের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন। ধর্মের এই ছয়টি ভিন্নার্থ হল, প্রথমত, 'Religion' অর্থে, যেমন- হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, 'Morality' অর্থে, যেমন- ধর্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসূত্র ইত্যাদি। তৃতীয়ত, 'Virtue' অর্থে, যেমন, সৎ আচরণ। চতুর্থত, রিলিজিয়ন বা নীতি অনুমোদিত অর্থে, যেমন- দান পরম ধর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম ইত্যাদি। পঞ্চমত, গুণ অর্থে, যেমন- মুখ্য গুণ, গৌণ গুণ। এবং ষষ্ঠত, আচার অর্থে, যেমন- দেশধর্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র এই ছয়টি অর্থের মধ্যে একটা সমস্যা লক্ষ্য করেছেন। ধর্ম কখনো রিলিজিয়নের প্রতি, কখনো নীতির প্রতি, কখনো অভ্যস্ত ধর্মাত্মতার প্রতি, আবার কখনো পুণ্যকর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে নীতির প্রকৃতি রিলিজিয়নে, রিলিজিয়নের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, কর্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত। ফলে রিলিজিয়ন–উপধর্মসংকুল, নীতি–ভ্রান্ত, অভ্যাস–কঠিন, এবং পুণ্য–দুঃখজনক হয়ে পড়েছে।[৩] তাই তিনি ধর্মের নতুন করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ধর্ম সম্পর্কে আমাদের যে অজ্ঞতা রয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে সেই অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম কেবল আচার বা উপাসনা নয়; মানুষকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে পৌঁছানোয় হল ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র আসলে 'ধর্ম' এই ধারণাটিকে এক বিশুদ্ধ অর্থে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, সমাজে ধর্ম, নীতি, অভ্যাস ও পুণ্যকর্ম এই চারটি পৃথক ধারণাকে একে অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার ফলে গভীর দার্শনিক ও সামাজিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম কখনো কেবল সম্প্রদায়গত বিশ্বাস ও আচার হিসেবে, কখনো নৈতিক বিধি হিসেবে, কখনো চরিত্রগত অভ্যাস হিসেবে আবার কখনো বিচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র প্রকৃতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে ধর্ম তার মানবোন্নতিকর সারবত্তা হারিয়ে উপধর্ম ও আচারবহুল রূপ ধারণ করেছে। নীতি যুক্তিনিষ্ঠ নৈতিকতা না হয়ে কুসংস্কারনির্ভর নিয়মে পরিণত হয়েছে। অভ্যাস স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রগঠনের বদলে কঠোর যান্ত্রিক আচরণে নেমে এসেছে এবং পুণ্যকর্ম আনন্দময় মানবকল্যাণের পরিবর্তে ভয় ও বাধ্যবাধকতার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু নীতিবোধের আধুনিক অবনতি এবং শিক্ষিত সমাজের অনাস্থার একটি প্রধান কারণ হল এই ধারণাগত বিশৃঙ্খলা। তাই তিনি ধর্মকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও মানবত্বের বিকাশের প্রক্রিয়া হিসেবে, যেখানে নীতি, কর্ম ও অভ্যাস সবই সুসংগতভাবে মানবকল্যাণের লক্ষ্যে যুক্ত থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা Religion শব্দের অনুরূপ। ধর্ম = ধৃ + মন্ (ধ্রিয়তি লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা)। এই জন্য আমি ধর্মকে Religion শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া

---

২. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৩০।

৩. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৬০৭-৬০৮।

নির্দেশ করিয়াছি"।[৪] এই Religion বা ধর্ম শব্দটি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য তিনি বিভিন্ন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতামত উল্লেখ করেছেন, তাঁর মধ্যে দার্শনিক সিলির মতটিকেই বিশেষ ভাবে সমর্থন করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে দার্শনিক সিলির মতটি হল "The Substance of Religion is Culture।"[৫] তিনি 'Religion' বা 'ধর্ম' শব্দটিকে কেবল শুষ্ক, আচারসর্বস্ব উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার না করে মনুষ্যত্ব বা মানববৃত্তির উৎকর্ষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

তিনি গ্রন্থের শুরুতেই দেখিয়েছেন যে, সকল মানুষ সুখের অনুসন্ধানী। মানুষ মনে করে ধার্মিক ব্যক্তি কখনও সুখী হতে পারে না। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে ধার্মিক হওয়া ও সুখী হওয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এই কথা বোঝানোর জন্য তিনি আমাদেরকে তাঁর রচিত *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুঃখ ও সুখ কি তা বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তাঁর রচিত *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের শুরুতেই তিনি বলেছেন বাচস্পতি মহাশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তি কিন্তু তার থেকে দুঃখী কেউ নেই। যখন সে দুঃখী তখন সে ধার্ম্মিক নয়। বাচস্পতি মহাশয় যথার্থ দুঃখী নন তিনি নিজের দোষে অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ত্রুটির কারণেই দুঃখ পাচ্ছেন।[৬] বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে এক সর্বজনীন বৃত্তির অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন।

তিনি *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে ধর্মের মূল লক্ষ্য হিসেবে মানববৃত্তির সম্যক বিকাশের কথা বলেছেন। মানুষের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি এই বিভিন্ন বৃত্তি আছে। ধর্মের কাজ হল এই বৃত্তিগুলিকে সুষম ও সঠিক পথে পরিচালনা করা। যে সাধনা মানুষের অন্তরের শক্তিকে উন্নত করে এবং তাকে সত্য, মঙ্গল ও কল্যাণের পথে নিয়ে যায় সেটাই প্রকৃত ধর্ম। সুতরাং ধর্ম কেবল বিশ্বাস নয়, এটি একটি নৈতিক-আধ্যাত্মিক অনুশীলন।

তিনি বলেছেন অনুশীলনতত্ত্বকে বুঝতে গেলে আগে সুখ ও মুক্তি কী তা বোঝা দরকার তবেই অনুশীলনতত্ত্বকে বোঝা যাবে।[৭] তাই বর্তমান এই প্রবন্ধে প্রথমে সুখের আলোচনা করে তারপর মুক্তির আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সুখ কী তা বোঝাতে গিয়ে *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, বৃত্তির অনুশীলনই সুখ। যদি বৃত্তির অনুশীলনই সুখ হয় তাহলে সেই সুখের উপাদান কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি তিন প্রকার সুখের উপাদানের কথা বলেছেন যথাঃ প্রথমত, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলন তজ্জনিত স্ফূর্তি ও পরিণতি। দ্বিতীয়ত, সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য। তৃতীয়ত, তাদৃশ্য অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি।[৮] এইগুলি হল সুখের উপাদান। এইভাবে তিনি সুখকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হিসাবে তিনি অনুশীলনের কথা বলেছেন।

এরপর তিনি মোক্ষের কথা আলোচনা করেছেন। *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে মুক্তি বা মোক্ষ শব্দটি সমার্থক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, "অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ"।[৯] তিনি মোক্ষ প্রসঙ্গে *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে আরও বলেছেন যে,

> "....তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে

৪. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ৬২ থেকে উদ্ধৃত।

৫. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩১।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৯।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৫২৬-৫২৭।

৮. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫২৯।

৯. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ১০৯ থেকে উদ্ধৃত।

> সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।"[১০]

এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে মুক্তি প্রসঙ্গে আরও বলেছেন,

> "কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত সে-ই ইহজীবনে সুখী। এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, সুখের উপায় ধর্ম। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা চিত্তমালিন্যবশত মুক্ত হইতে পারে না।"[১১]

তিনি আরও বলেছেন, মুক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্ব। অন্যত্র তাঁর নিজের উক্তি হল "ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই ভক্তি।"[১২] সুতরাং তাঁর মতে ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম নেই ও অনুশীলনও নেই।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, মানুষের সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলনের দ্বারা সম্যক্ স্ফুর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই ধর্মের লক্ষ্য। তাঁর মতে, তিনিই আদর্শ মানুষ যার সকল বৃত্তি সম্যক্ স্ফুর্তি, পরিণতি ও পরস্পর সামঞ্জস্য। আর এই অবস্থাই হল প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এটিই হল মোক্ষ।[১৩]

বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম কি তা বোঝাতে গিয়ে 'মানুষের ধর্ম' কথাটি ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের ক্রোড়পত্র 'ক'-এ ধর্মের যে ছয়টি ভিন্নার্থ উল্লেখ করেছেন তারমধ্যে ধর্মের পঞ্চম যে অর্থটি সেই অর্থেই তিনি এখানে ধর্ম বলতে মানুষের ধর্মকে বুঝিয়েছেন। তিনি ধর্ম বলতে মানুষের গুণের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। যে গুণটি মানুষের মধ্যে থাকলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে আর যা না থাকলে মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করা যায় না। সেইজন্য মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম বলা হয়েছে। যেমন চৌম্বকের ধর্ম লৌহকর্ষণ, অগ্নির ধর্ম দাহকতা ঠিক তেমনি মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। মানুষের ধর্ম কি? শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম। এটিই হল মনুষ্যত্ব।[১৪] সেই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন, "যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয় সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলা হয়।"[১৫]

মানুষের অন্তরে কতকগুলি শক্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে এই শক্তিগুলিকে 'বৃত্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'বৃত্তি' শব্দটি আবার বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে 'বৃত্তি' বলতে ইংরেজি 'Faculty' শব্দটিকেই নির্দেশ করেছেন। তিনি দুই ধরনের বৃত্তির কথা বলেছেন যথা- শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি। মানসিক বৃত্তিগুলি আবার তিন প্রকার যথাঃ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি, কার্যকারিণী বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। যে বৃত্তিগুলি জ্ঞান অর্জন করে তাকে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি বলা হয়, আর যে বৃত্তগুলি কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাকে কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলা হয়, আর যে বৃত্তিগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না আবার কার্যে প্রবৃত্ত হয় না শুধুমাত্র আনন্দ দেয় তাকে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি বলা হয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে তিনি মানুষের

---

১০. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩৪।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৭৫।

১২. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ১১০ থেকে উদ্ধৃত।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৫ থেকে উদ্ধৃত।

১৪. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ৬৩।

১৫. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩১।

বৃত্তিগুলিকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করেছেন যথাঃ এক, শারীরিক বৃত্তি, দুই, জ্ঞানার্জনীয় বৃত্তি, তিন, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, চার, চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতাই হল মনুষ্যত্ব।[১৬] তাঁর মতে এই সকল বৃত্তিগুলির যথার্থ অনুশীলন ও পারস্পরিক সামঞ্জস্যই হল প্রকৃত মনুষ্যত্ব আর এটাই হল মানবধর্ম। আর এই অনুশীলনের ওপরেই প্রকৃত মানবধর্ম নির্ভর করে।

এই বৃত্তিগুলির পারস্পরিক সামঞ্জস্য হল অনুশীলনের সীমা। আর এই বৃত্তিগুলির পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের ফল হল সুখ। যখন এই সমস্ত বৃত্তিগুলির অনুশীলন করা হয় তখন সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। এই অবস্থাকে ভক্তি বলা হয়।[১৭] ভক্তির পরেই প্রীতি কারণ তাঁর মতে বৃত্তিগুলির মধ্যে ভক্তি ও প্রীতি এই দুটি বৃত্তি সর্বশ্রেষ্ট। তিনি প্রীতিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন যথাঃ প্রথমত, আত্মপ্রীতি, দ্বিতীয়ত, স্বজনপ্রীতি, তৃতীয়ত, স্বদেশপ্রীতি এবং চতুর্থত, পশুপ্রীতি। তিনি বলেন সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এইজন্য সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত। সর্বভূতের প্রতি প্রীতিই হল ভক্তি, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব।[১৮]

তাঁর ধর্মচিন্তা কেবল আচারনির্ভর নয় বরং এক নৈতিক ও মানবিক আদর্শ। তাঁর মতে, "ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম।"[১৯] এই বক্তব্যটির অর্থ বিশ্লেষণ করলে যা পায় তা হল তিনি ঈশ্বর বলতে কেবল ঈশ্বরের পূজা-অর্চনাকেই বোঝাননি। তাঁর মতে ঈশ্বর হলেন সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রতীক। তিনি ঈশ্বরে ভক্তি বলতে আসলে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করা। এই ভক্তি মানুষকে স্বার্থপরতা, হিংসা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে এক উচ্চতর চেতনায় উন্নীত করে। সুতরাং ঈশ্বরে ভক্তি হল আত্মার উৎকর্ষের পথ। তিনি মনে করেন যদি ঈশ্বরপ্রেম মানুষের প্রতি প্রেমে প্রকাশ না পায় তবে তা প্রকৃত ভক্তি নয়। মানবপ্রেম অর্থাৎ সহানুভূতি, দয়া, পরোপকার ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি হল ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। মানুষের সেবা ও মঙ্গল চিন্তাই ঈশ্বরভক্তির বাস্তব রূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ঈশ্বরে ভক্তি ও মানবপ্রেম এই দুইয়ের সমন্বয়ই হল ধর্মের সার। তিনি অনুশীলন বলতে চরিত্রগঠন ও আত্মশুদ্ধির ধারাবাহিক চর্চাকেই বুঝিয়েছেন। এই অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল এমন এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছানো যেখানে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও মানুষের প্রতি প্রেমময় হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, প্রকৃত ধর্ম কোনো সংকীর্ণ আচার নয়। ধর্ম হল নৈতিকতা ও মানবতার আদর্শ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি মানুষকে আত্মিকভাবে উন্নত করে এবং মানুষের প্রতি প্রেম তাকে সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ করে। এই দুইয়ের সমন্বয়েই সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মনুষ্যত্ব তার চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, প্রকৃত সুখ বস্তুগত ভোগে নয়; আত্মিক শান্তি ও মানবকল্যাণে নিহিত। ঈশ্বরভক্তি মানুষকে অন্তরের প্রশান্তি দেয় এবং মানবপ্রেম সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন করে। এই দুইয়ের সমন্বয়েই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাই তিনি একে "মনুষ্যত্বের চরম" বলে অভিহিত করেছেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, দুঃখ থেকে সুখে যাওয়ার জন্য এক সেতুর প্রয়োজন সেই সেতুটি হল ধর্ম। এখানে ধর্ম মানে কোনো বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি নয়, বরং 'ধৃ' ধাতু থেকে আসা সেই সত্তা যা ধারণ করলে সমাজ ও জগত খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া থেকে রক্ষা পায়। বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সেই সেতুবন্ধনের কাজটিই করার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে 'ধর্ম' সম্পর্কে এক নতুন ও সহজ সরল

---

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৩৫।

১৭. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৫৯।

১৮. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ৭৫।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫ থেকে উদ্ধৃত।

ব্যাখ্যা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে যে নৈতিক গুণাবলী রয়েছে যেমন- সত্য, ন্যায়, প্রেম, দয়া, আত্মসংযোগ ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতির বিকাশই হল প্রকৃত ধর্ম। এই গুণগুলির সমন্বয়ই হল মানবতার প্রকৃত রূপ। আমরা সকলেই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রান পেতে চাই। এই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রান চাওয়া মানে হল আমি সুখে থাকতে চাই বা সুখ পেতে চাই। তাই দুঃখ হল মানুষের চিরস্থায়ী সমস্যা আর সুখ হল মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই সমস্যার সমাধান ও আকাঙ্ক্ষার একমাত্র পথ হল ধর্ম। একমাত্র ধর্মই পারে মানুষকে দুঃখের হাত থেকে পরিত্রান দিতে। ধর্মই হল সুখের একমাত্র উপায়।[২০] বঙ্কিমচন্দ্র তিন প্রকার সুখের কথা বলেছেন যথাঃ প্রথমত, স্থায়ী সুখ, দ্বিতীয়ত, ক্ষনিক কিন্তু পরিমাণে দুঃখশূন্য এবং তৃতীয়ত, ক্ষনিক কিন্তু পরিমাণে দুঃখের কারণ। শেষোক্ত সুখ সুখই নয়, দুঃখের প্রথম অবস্থা মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্মকে সুখের উপায় বলেছেন তখন সুখ শব্দের দ্বারা স্থায়ী বা পরিমাণে দুঃখশূন্য সুখকেই নির্দেশ করেছেন। তাঁর প্রচারিত অনুশীলন ধর্মের উদ্দেশ্য ঐরূপ সুখ। অর্থাৎ যেরূপ অনুশীলনে স্থায়ী সুখ বা দুঃখশূন্য সুখ জন্মে তাই বিহিত। এইরূপ সুখই ধর্মের কষ্টিপাথর। অন্যত্র তিনি বলেছেন সুখের উপায় ধর্ম আর মনুষ্যত্বেই সুখ, সুতরাং সুখই সেই কষ্টিপাথর।[২১] তিনি *'ধর্মতত্ত্ব'* গ্রন্থে ধর্ম বলতে কোন অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারকে বোঝাননি। তিনি ধর্ম বলতে অনুশীলনকে বুঝিয়েছেন আর এই অনুশীলনের ওপরেই প্রকৃত মানবধর্ম নির্ভর করে। তাই 'ধর্ম' বলতে তিনি মানবতা বা মানবধর্মকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি মানবাতকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি চরিত্রগঠন, আত্মনিয়ন্ত্রন ও নৈতিক শুদ্ধির কথা বলেছেন আর দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি অপরের মঙ্গলচিন্তা, সমাজকল্যাণ ও পরোপকারের কথা বলেছেন। আর এই দু-য়ের সমন্বয়েই মানবতার পূর্ণতা অর্জিত হয়। তাঁর মতে মনুষ্যত্বের উন্নতিই হল মানবতা। ধর্ম মনুষ্যত্বকে উন্নত করে। এখানে মনুষ্যত্ব মানেই মানবতা অর্থাৎ মানুষের ভেতরে যে নৈতিক গুণগুলি রয়েছে যেমন সত্যনিষ্টা, ন্যায়বোধ, দয়া, প্রেম, কর্তব্যবোধ এবং আত্মসংযম প্রভৃতি এই গুণগুলির চর্চা ও বিকাশই হল প্রকৃত মানবতা।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বাগল, যোগেশচন্দ্র। বঙ্কিম রচনাবলী (সম্পাদিত)। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪৩০।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ। দাস, শ্রীসজনীকান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র (সম্পাদিত)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৯।
৩. মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ। বঙ্কিম-পরিচয় (সম্পাদিত)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৩৮।
৪. সমাজপতি, সুরেশকুমার। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ। দাস, শ্রীসজনীকান্ত। বিবিধ প্রবন্ধ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৬।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ। দাস, শ্রীসজনীকান্ত। ধর্ম্মতত্ত্ব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৮৮৮।

২০. *বঙ্কিম রচনাবলী,* যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩০।

২১. *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র,* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ৬৯ থেকে উদ্ধৃত।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বসু, শ্রীলেখা। বঙ্কিম-চর্চা। (২০০৮), কলকাতা: গ্রন্থমিত্র।
২. দত্ত, ভবতোষ। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। (১৯৬১), কলকাতা: জিজ্ঞাসা।
৩. দত্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র। (১৩৪৭), কলকাতা: শ্রী ভারতী প্রেস।
৪. দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রকুমার। প্রবন্ধ সংগ্রহ। (২০১০), কলকাতা: এবং মুশায়েরা।
৫. দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রকুমার। বিবিধ প্রবন্ধ। (২০০৭), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. দে, নাড়ুগোপাল। উনিশ শতকের বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র। (২০১০), কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
৭. মজুমদার, মোহিতলাল। বঙ্কিম-বরণ। (১৩৫৬), হাওড়া: বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়।
৮. পোদ্দার, অরবিন্দ। বঙ্কিম মানস। (১৩৫৮), কলকাতা: ইন্ডিয়ানা লিমিটেড।
৯. সেনগুপ্ত, শ্রীসুবধচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র। (১৩৪৫), কলকাতা: এস, সি সরকার এন্ড সনস লিমিটেড।
১০. সিংহ, শ্রীবিমলচন্দ্র। বঙ্কিম-প্রতিভা। (১৩৪৫), কলকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাইস।
১১. তেওয়ারি, রামবহাল। বঙ্কিম বীক্ষা। (১৯৯৩), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।